সপ্তম অধ্যায়

রাজকৃষ্ণ রায় এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের নাট্যবলয়ের মধ্যে পুরাণ কাহিনি অবলম্বন করে যাঁরা নাটক রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ নাট্যকার উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি নিয়ে এ পর্বের নাট্যকারেরা প্রচুর নাটক লিখেছেন। কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলা নাট্যকারেরা বরাবরই মহাকাব্যের অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করেছেন। নাট্যঘটনার উপস্থাপনে নাট্যিকক্রিয়ার অত্যধিক তারল্য ও গীতি প্রবণতা এসকল নাটকের অন্যতম লক্ষণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপের ক্ষেত্রে নাট্যকারেরা মূলত পদ্যভাষাকে অবলম্বন করেছেন। গৈরিশছন্দ অনুকরণের ব্যর্থতাও অপ্রকাশিত থাকে নি। তবু মহাভারতীয় কাহিনির নাট্যরূপায়ণে নাট্য সংখ্যার দিক থেকে এই পর্বের নাটকগুলি উপেক্ষিত নয়। 'দুর্বাশার পারণ', 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' বা ভীষ্মের জীবন কেন্দ্রিক নাটকগুলি সমকালীন দর্শক সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মহাভারত আশ্রয়ী নাটকের বিবর্তনের ধারায় এসকল নাটকগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) :

রাজকৃষ্ণ রায় একজন বিশিষ্ট নট-নাট্যকার নাট্যসংগঠক কবি ও সাময়িকপত্র সম্পাদক। 'বীণাযন্ত্র' নামে প্রেস স্থাপন ও 'বীণা' মাসিকপত্র প্রকাশ ছাড়াও 'সমাজদর্পণ' ও 'গল্পকল্পতরু' সাময়িকপত্রের সম্পাদনা করেন। 'ভারতকোষ' নামে ভারতবিষয়ক প্রথম বিশ্বকোষের সংকলক ছিলেন রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব। সম্ভবত তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি সাহিত্যকে পেশারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষকে অনুসরণ করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে যেসকল নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রধান। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিবাদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মসমর্পনের মধ্যে সেখানে কোনও দ্বিধা সংশয় বা কামনা নেই। রাজকৃষ্ণের ভক্তিবাদের সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক আদর্শের সংমিশ্রণ লক্ষকরা যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ ভক্তকে রক্ষা ও অভক্তকে বিনাশ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটক সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল দর্শকের প্রিয়, কিন্তু রাজকৃষ্ণের ভক্তিমূলক নাটক সাধারণ বাঙালি দর্শকের নিকট আদরনীয়। তাঁর ভক্তিমূলক নাটকগুলি যাত্রার সমধর্মী। নাট্যসমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মাহাশয় তাঁর নাট্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-

> ''রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটক মাত্রই যাত্রা, প্রকৃত নাটক নহে; অথচ এই পৌরাণিক নাটক রচনাতেই তাঁহার একমাত্র সার্থকতা। অতএব একদিক দিয়া যেমন তিনি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নিকট ঋণী, তেমনি অন্যদিকে এই যুগের প্রবর্তক মনোমোহন বসুর নিকটও তাহার ঋণ আস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই উভয়ের প্রভাবের মধ্যবর্তী হওয়ায় তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কোনও সুযোগ হয় নাই।''[১]

রাজকৃষ্ণের নাটকে অলৌকিকতার প্রাবল্য সাময়িকভাবে দর্শকের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও সাহিত্যের মানদণ্ডে তার স্থান সংকীর্ণ। তাঁর রচনার মধ্যে গ্রাম্যতা প্রকাশ পেলেও অশ্লীলতা নেই। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে গৈরিশছন্দের অনুসরণ করেন। পরে তিনি নিজেই একপ্রকার ছন্দের উদ্ভাবন করেন, যাকে তিনি 'পদ্যপংক্তি গদ্য' বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তবিক তার ছন্দ মূলত গদ্যই, কেবল গৈরিশছন্দের আকারে লিখিত।

রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলি হলো- দুর্বাশার পারণ, ভীষ্মের শরশয্যা, যদুবংশধ্বংস (১৮৮৪) ও প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৯১)। উল্লেখিত নাটকগুলির কাহিনি বিন্যাসে মহাকাব্যের প্রতিফলন আলোচনা সাপেক্ষ।

দুর্বাসার পারণ :

মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরাদির ক্যামকবনে অবস্থান কালে দুর্যোধন রাজৈশ্বর্যের গড়িমা প্রদর্শন করে পাণ্ডবদের চক্ষু পীড়নের লক্ষ্যে সদলবলে আগমন করেন এবং গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কাছে লাঞ্ছিত হন। পাণ্ডবদের সহায়তায় সবান্ধব দুর্যোধন চিত্রসেনের হাত থেকে কোন ক্রমে রক্ষা পেলেও এহেন অপমান মেনে নিতে না পেরে আত্মনাশের সংকল্প করেন। কর্ণ শকুনি প্রমুখের সান্তনা দানে প্রশমিত হলেও তিনি অপমানের কথা ভুলতে পারেন নি। অনতিকাল পরে হস্তিনাপুরে দুর্বাসা মুণির আগমন ঘটলে দুর্যোধন তাকে সেবাযত্নে তুষ্ট করে সশিষ্য পাণ্ডবদের কাছে প্রেরণের বর লাভ করেন। অভিশাপের জন্য বিখ্যাত দুর্বাসা মুনির উপস্থিতিতে অপ্রস্তুত পাণ্ডবগণকে ক্রোধানলে পীড়িত করার জন্য দুর্যোধনের এই পরিকল্পনা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ব্যর্থ হয়েছে। মহাভারতের এই আখ্যানকেই 'দুর্বাসার পারণ' নাটকের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছেন রাজকৃষ্ণ রায়।

হস্তিনাপুরে সপারিষদ দুর্যোধনের সভায় বিদূষকের হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল স্তুতিবাদের মধ্য দিয়ে নাটকের সূত্রপাত। রাজসভায় বিদূষক না থাকলে জমে না, তাই চরিত্রটি নাট্যকার সংযোজন করেছেন। মিষ্টান্নপ্রিয় বিদূষককে আপাতভাবে মূর্খ মনে হলেও সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তার প্রত্যেক কথাতেই নিগূঢ় ব্যঙ্গ রয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত পাণ্ডবদের রাজকীয় ঐশ্বর্য দেখানোর যে প্রস্তাব শকুনি পেশ করেন তা কর্ণও সমর্থন করেছেন।

শকুনি : অতুল ঐশ্বর্য্য তব এত যে হইল।
বড় দুখ এ সম্পদ শত্রু না দেখিল।।
কর্ণ : নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে।
ধন তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে।।

দ্বৈতবনে গন্ধর্বের হাতে ধরা পরে শকুনি নিজেকে দোষমুক্ত করার জন্য বিস্ময়কর চাতুর্যে তার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করেও অপমানের হাত থেকে রেহাই পান না।

শকুনিকে গাধা বানিয়ে তার পিঠে বিদূষককে চাপিয়ে দড়ি বেঁধে চিত্রসেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে শকুনির ভাষ্য -

'আমি কেন পাণ্ডবদের বনে পাঠাব?
তারা দুর্য্যোধনের দোষে বনে এসছে,
আমি বরং তাদের আজ কৌশলে
উদ্ধার করবো বলে এসেছি। (২/৩)

মহাভারতে না থাকলেও নাটকে দুর্যোধন মহিষী ভানুমতীকে বনবাসী দ্রৌপদীর করুণ পরিণতি নিয়ে পরিহাস করতে দেখা যায়। তার আমোদের জন্য চিত্রকরী ভিখারিনী দ্রৌপদীর ছবি অঙ্কন করে এনেছেন। অথচ গন্ধর্বেরা যখন তাদের বন্দিকরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন দ্রৌপদীকে সহানুভূতিশীল হতে দেখা যায়। ভানুমতির মঙ্গলের জন্য তিনি দেবীর স্তব করেছেন, যুধিষ্ঠিরকে করেছেন আত্মসচেতন, 'তব ভ্রাতৃজায়া গন্ধর্বের কারাগারে।/ ধর্মরাজ। এ কি ধর্ম্ম তব?'(৩/ ১)

মহাভারতে দুর্যোধন চিত্রসেনের কাছে পরাজিত হয়ে পাণ্ডবদের কৃপায় মুক্তি লাভের লজ্জাজনক চরম অপমান ভুলতে আত্মনাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে কর্ণ স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেন-

''পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে শত্রু হইতে বিমুক্ত করিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রাজ্যান্তর্বাসী ব্যক্তি ও সৈনিক-পুরুষেরা সমক্ষেই হউক অথবা অসমক্ষেই হউক, প্রাণপণে অবশ্যই প্রভুর প্রিয়কার্য সম্পাদন করিবে।''[৩]

নাটকে দুর্যোধন অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য স্বয়ং এসেছেন দুর্বাসার আশ্রমে। তাঁকে হস্তিনাপুরীতে সশিষ্য আমন্ত্রণ জানান। মহাভারতে দুর্বাসা স্বইচ্ছাতেই হস্তিনাপুরীতে আগমণ করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় দুর্যোধনকে দুর্বাসার আশ্রমে প্রেরণ করে দুটি ঘটনাকে কার্য-কারণ সূত্রে জুড়ে দিয়েছেন। দুর্যোধনের অভিপ্রায়-

''দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেইস্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চজনে।।
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডববংশ ঘুচিবে সন্তাপ।।''[৪]

দুর্যোধনকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বৈতবনে সশিষ্য আগমন করে দুর্বাসা প্রথমেই জানিয়েছেন- 'গতকল্য শিষ্যগণ সনে/ করিয়াছি একাদশী উপবাস/ অদ্য তোমার নিকটে করিব পারণ।'(৪/২) অবশ্য দুর্বাসা তাঁর কৃতকর্মের জন্য আত্মসমালোচনাও করেছেন মনে মনে। প্রভাসে স্নান করতে যাওয়ার সময় তিনি ঠিক কাজ করছেন কি না তা ভেবে স্বআশ্রমে প্রত্যাবর্তন করার কথা ভেবেছেন আবার দুর্যোধনকে দেয়া বরকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। পৌরাণিক যে দুর্বাসা আত্মপর বিবেচনা না করে কথায় কথায় অভিশাপ দেন তাঁকে আত্মসমালোচনার নমনীয়তা দান করেছেন নাট্যকার।

আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলে ভক্তের ডাকে সারা দিয়ে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অবশিষ্ট এক কণা শাকান্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত হলে সকলেরই ক্ষুনিবৃত্তি হয়। ''সর্বভূতে আত্মারূপে যেই নারায়ণ।/ তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন।''[৫] স্নানান্তে দুর্বাসাকে ভোজনের জন্য ভীম আহবান করতে এলে মুনি সশিষ্য পলায়ন করেছেন। কাশীরামের আখ্যানটিকে প্রলম্বিত করে পরের দিন দুর্বাসার ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন-

''ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া প্রত্যূষে।
অতিথি হইয়া যাব পাণ্ডব সকাশে।।''[৬]

মহাভারতের এই পর্বে কৃষ্ণের সঙ্গে দুর্বাসার সাক্ষাৎ ঘটেনি। নাটকে দুর্বাসা তাঁর কৃত কর্মের নেপথ্যে ত্রিভঙ্গ মুরারির রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতেই এ হেন পন্থা অবলম্বন করেছেন। সব নদীর উৎপত্তি স্থান ভিন্ন হলেও তা যেমন শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে এসে মেশে, পৌরাণিক নাটকগুলিও তেমনি শেষ পর্যন্ত ভক্তিরসের স্রোতে ভেসে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করেছে।

ভীষ্মের শরশয্যা :

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব ও ভীষ্ম পর্ব অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকের নামে ভীষ্মের উল্লেখ থাকলেও ভীষ্মের চরিত্র অপেক্ষা মহাভারতীয় কাহিনির উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভীষ্মের মৃত্যুর ঘটনায় নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে বলে নাম করণ হয়েছে 'ভীষ্মের শরশয্যা'। পাণ্ডবদের বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর রাজ্যার্ধ দাবির প্রেক্ষিতে কৌরব মহলে মন্ত্রনায় শকুনির ভূমিকা নাটকে গুরুত্ব পেয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রকে আপন সন্তানদের স্বার্থ রক্ষার্থে পাণ্ডবদের বঞ্চিত করার নানান পরামর্শ দানে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন শকুনি- 'পাণ্ডবেরা যৎসামান্য রাজ্যভাগ পেলে, সমস্ত পৃথিবী তুমি হারাইবে রাজা।'(১/২)

পাণ্ডবদের নিমন্ত্রণ করে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে শত্রুনাশের পরিকল্পনা বা বিরাট নগরের চতুর্দিকে আগুন জ্বালানোর হীনপরামর্শ দুর্যোধনের মনঃপুত হয়না। মহাভারতে এমন পরামর্শের উল্লেখ নেই। আবার শকুনির আস্ফালন ভীমের কথা স্মরণে কিছুটা স্তিমিত হয়। রাজ্যার্ধ প্রত্যার্পন করাটাই যুক্তিসিদ্ধ কিনা ভীরু কণ্ঠে তা দুর্যোধনের কাছে ব্যক্ত করেন। ভীমকে তাঁর ভীষণ ভয় - 'যে ভীম!/ হিমশিম্ খাইয়ে দেবে/ সে আবার আমাকে শাসিয়ে গেছে/ আমারি পাশার হাড়/ আমারি চোখে গুঁজে দিয়ে/ দ্বিতীয় ধৃতরাষ্ট্র করবে।'(১/২) মহাভারতে এমত আশঙ্কার উল্লেখ নেই। বয়সের দোহাই দিলেও তার চরিত্রের মধ্যে ভীরু এবং কমিক ভাব অপ্রকাশিত থাকেনি। যুদ্ধের আমন্ত্রণপত্র লিখতে শকুনির হাত কাঁপে। কিন্তু তিনি বলেন, ভয়ে নয় লিখতে গেলেই হাত কাঁপে। তার ভীরু স্বভাবের জন্যই যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন ছলে কৌশলে যা হয় যুদ্ধে তার সিকিভাগও লাভ হয় না। তিনি দুর্যোধনের ক্রোধকে বড় শত্রু বলে সমালোচনা করেছেন। অবশ্য তার যুদ্ধ বিমুখতা মহানুভবতা জাত নয়, ভীরুতা থেকে নিস্পন্ন। কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনার পরামর্শ শকুনিই দুর্যোধনকে দিয়েছেন, কেননা- 'কৃষ্ণ আমার চেয়েও ছলকৌশলী/ ধরি মাছ না ছুঁই জল।(১/৩)

যুধিষ্ঠিরদের ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে হস্তিনার অতিথিশালায় ভিক্ষুকদের সঙ্গে থাকার কথা কর্ণ মহাভারতে বলেননি। পাণ্ডব পুরোহিত ধৌম্যকে দিয়ে কর্ণকে কটাক্ষ করার জন্যই নাট্যকার এ

প্রসঙ্গের সংযোজন করেছেন। ধৌম প্রতিআক্রমণ করেছেন, ‘পরান্নের মর্ম বুঝ তুমি/ তেই কহ কটু ভাষা।’(১/২)

যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষের সঙ্গে আপোশ মীমাংসায় সচেষ্ট হলেও ভীম কোনো ভাবেই তা সমর্থন করতে পারেন নি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ‘আমি যে এত কাল ধরে/ গদা যুদ্ধ শিক্ষা করলেম/ তার পরীক্ষা দেক্তেও কি/ আপনার সাধ হয় না?’(২/১) ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের মধ্যে ভীম কোন তফাৎ দেখতে পান না। ‘যে ধৃতরাষ্ট্র সেই দুর্য্যোধন, যে দুর্য্যোধন সেই ধৃতরাষ্ট্র।’(২/১) একই পরিস্থিতিতে মহাভারতে ভীমকেও বিনম্র হতে দেখা গেছে-

> ‘‘হে মধুসূদন! তুমি কুরুসভায় গমন করিয়া যাহাতে আমাদের উভয় পক্ষের শান্তিলাভ হয়, এরূপ কথা কহিবে; যুদ্ধের কথা উত্থাপন করিয়া কদাচ কৌবরগণকে ভীত করিও না; দুর্য্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিও না। সান্ত্ববাদদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিও। তুমি আমাদের পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণকে বলিবে যে, যাহাতে আমাদের পরস্পর সৌভাত্র জন্মে ও দুর্য্যোধন প্রশান্ত হয়, তাঁহারা এমন কোন উপায় নির্দ্ধারিত করুন।’’[৭]

বিদুরের কুটিরে কৃষ্ণের আগমনকে কেন্দ্রকরে ভক্তিরসের প্লাবন বয়ে গেছে। কুন্তী ও বিদুরের কৃষ্ণভক্তিতে বৈষ্ণবীয় প্রভাব কীর্তনের সুরে প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

‘ধরা তো সামান্য বাঁধিব তোমারে,
চোর-চূড়ামণি তুমি।
আজ্ ভকতি-ডোরে বাঁধিব তোমারে
ছেড়ে দিব না ছেড়ে দিব না,
চোরে না বাঁধিলে পরে
ঐ রাঙা চরণ আর পাব না।’(২/৫)

নাটকে কর্ণ জানেন যে তিনি কুন্তীর পুত্র। কৃষ্ণের কথায় জন্মরহস্য উন্মোচনের নাটকীয় বিস্ময় অনুপস্থিত। বরীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যনাট্যে যে বিস্ময়াবেগের আন্দোলন তুলেছেন তা এখানে নেই। কর্ণ কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম ঈশ্বর বলে মেনে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণের চরণ

দর্শন করে প্রাণ ত্যাগের বাসনায় কাতর। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তির বাসনাই বাংলা নাটকে বহু ক্ষেত্রে চরিত্রের মেরুদন্ডকে ভঙ্গুর করে দিয়েছে।

নাটকে কর্ণের চিত্ত বৈকল্য দেখা যায়। পান্ডব পক্ষের প্রতি তাঁর দুর্বলতা নাট্যকার উল্লেখ করেছেন। তবে পান্ডব পক্ষে গেলেও সে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করে নেবেন। তাও যদি না পান, তাহলে অঙ্গ রাজ্য দান করে দেবেন। তাও যদি না দেন তাহলে ছয় ভাই বনবাসী হবে। 'যুধিষ্ঠির!/ তব পাশে এই যাই -এই যাই, ভাই।'(৩/৩) মহাভারতে এ ধরণের দুর্বলতা স্থান পায় নি। কর্ণ কৃষ্ণকে যথোচিত উত্তর প্রদান করেছেন-

''যদ্যপি জানি যে আমি পান্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়।।
অর্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণ মারিবেক ধ্রুপদ-নন্দন।।
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র এই শত সহোদর।
পাঠাবে শমন ঘরে বীর বৃকদর।।
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম জান প্রতিজ্ঞা-পালনে।।''[৮]

মহাভারতে ভীষ্ম দুর্যোধনকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, ''আমি তোমার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পান্ডবগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্যান্য শত্রুদিগকে বিনষ্ট করিব।''[৯] নাটকে কৌরব সেনাপতির মনে আত্মধিক্কার রণিত হয়েছে, পান্ডবদের প্রতি তাঁর স্নেহাশীর্বাদ অগোপন থাকে নি। 'অবশেষে দারুণ আহবে/ আমারেই বলে সেনাপতি হতে।/ ধিক্ মোরে!/ ধিক অর্থে!/ এ হেন দাসত্বে শত ধিক!'(৩/৪)

কাশীরামের আখ্যানে-

''ভীষ্ম কহিলেন তবে কৌবর-ঈশ্বরে।
দশ দিন ভার মম হইল সমরে।।

নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যেরে নাশিব।
রথী দশ সহস্রেরে প্রত্যহ মারিব।।
অর্জুনসহিত যুদ্ধ শ্রীহরি-সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত।।''[১০]

ভীষ্ম ও কর্ণের মধ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বিবাদ নাটকে গুরুত্ব পায় নি। কর্ণ সহজ ভাবেই ভীষ্মের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন ফলে কর্ণের দম্ভোক্তি নাটকে ম্রিয়মান, ''ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না''[১১]

নাটকের চরিত্রগুলি অত্যধিক ভালোমানুষীর পরিচয় দিয়েছেন, ভক্তিরসে এতটাই বিগলিত হয়েছেন যে মহাকাব্যিক সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। নাটকে যুযুৎসু স্বেচ্ছায় পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করতে এলে যুধিষ্ঠির বিড়ম্বনা বোধ করেছেন, 'এই আপৎকালে/ তুই আমার পক্ষে থাকলে/ সুযোধন তোকে কি বলবে, বল দিকি?'(৪/১) দুর্যোধন পুত্র লক্ষণের সঙ্গে যুযুৎসুর সংলাপে মেঘনাদের ছায়াপাত ঘটেছে-

লক্ষণ : এ হেন আত্মীয়গণে ত্যজি/ মজিলে শত্রুর প্রলোভনে!
যুযুৎসু : এস এস/ খুড়া ভাইপোয় মিলি/ হরিপূজা ধর্মপূজা করি ভক্তি ভরে।
লক্ষণ : সম্রাটের পুত্র হয়ে আমি/ পূজিব প্রজারে ভক্তি ভরে? (৪/৭)

অর্জুনের দুর্যোধনের মুকুট ধারণ করে ভীষ্মের নিকট থেকে ছল করে পঞ্চবাণ প্রাপ্তির ঘটনা কাশীরামের আখ্যান থেকে নেয়া হয়েছে। ভীষ্ম আত্মবলি দানের মাধ্যমে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকে তিনি বলেছেন, 'যাঁর প্রাণ, তাঁরে দিব,/ এর চেয়ে আনন্দ কি আর?' (৪/৬) ভীষ্ম প্রায় নিঃচেষ্ট থেকে বিপক্ষকে আত্মনাশের উপায় বলে দিয়ে অতি দ্রুত মহাযুদ্ধ থেকে বিদায় নিয়েছেন। অন্তিমকালে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দেখার তীব্র বাসনাতেই তিনি কৃষ্ণের কাছে মিনতি করেছেন, 'বধ মোরে দামোদর'। নাটকে কৃষ্ণের একনায়কত্বই ভীষ্ম নিধনের যন্ত্রণাকে ম্লান করে দিয়েছে।

যদুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪):

মহাভারতে মৌসলপর্বে গান্ধারীর অভিশাপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর যদুকুল ধ্বংসের কাহিনি অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক 'যদুবংশ ধ্বংস'। নাটকের শুরুতে কালপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছে দেবতাদের যদুবংশ নাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন। মহাভারতে ভীষণ দর্শন কালপুরুষ ধ্বংসের পূর্বাভাস সূচিত করেছেন নারকীয় উপদ্রপে। ''কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরা বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন।''[১২] মদমত্তে প্লাবিত আত্মকুল বিনাশের অনিবার্যতাকে শ্রীকৃষ্ণ সহজে মেনে নিলেও বলরাম তাঁর হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করতে পারেন না, 'বুঝি বুঝি, কিন্তু পুনরপি/ নারি রে বুঝিতে কথা তোর।'(৩/২) তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করতে পারেন না। তাই নাটকে মায়া চরিত্র অনুপ্রবেশ করেছে। রাজ্যের দুর্লক্ষণ প্রতিহত করার জন্য অশুভবিনাশ যজ্ঞের পুরোহিত রূপে দুবার্সা মুনিকে এনেছেন নাট্যকার। মহাভারতের এই পর্বে বিশ্বামিত্র, কণ্ব, নারদ প্রমূখের উল্লেখ থাকলেও দুর্বাসা অনুপস্থিত। কৃষ্ণ পুত্রদের উপর বর্ষিত মুসল প্রসবের অভিশাপকে অলঙ্ঘনীয় দৃঢ়তা দান করার জন্য অতিপরিচিত কোপন স্বভাব দুর্বাসার নামটিকে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। 'নাহি ক্ষমা; ক্ষমা যদি করি/ না রবে নামের গুণ মোর/ যদুবংশ ধ্বংস সুনিশ্চয়।'(২/৫) শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপ অলঙ্ঘনীয় বলে, 'সবি আমি পারি/ কিন্তু আমি নারি/ ব্রহ্মশাপ করিতে লঙ্ঘন।'(২/৬) অন্যদিকে বলরাম দুর্বাসার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে যদুকুল রক্ষার প্রয়াসের কথা ভাবেন। যদি ক্ষমাভিক্ষায় দুর্বাসার মন না গলে তবে তাঁকে বধ করবেন বলে সংকল্পকৃত হন, 'অভিশপ্ত, অভিশাপ দাতা/ ইহলোক একত্রে ত্যাজিবে'(৩/২)

প্রভাসের তীরে কৃষ্ণ মদোন্মত্ত সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব ও অন্যান্য সকল যদুগণকে ইন্দন যুগিয়েছেন আত্মনাশের ধ্বংস যজ্ঞে। কৃষ্ণ বললেন, 'এস এস, বীরগণ!/ প্রভাস উৎসবে মাতিয়াছ সবে/ এক অঙ্গ এখনো যে বাকী/ নিজ নিজ বীরত্ব কাহিনী/ বর্ণিতে হইবে

আজি হেথা/ সেই অঙ্গ করহ পূরণ/ কহ, হে সাত্যকি!/ কিরূপে দলিলে বলে কুরুসৈন্যগণে?'(৪/১) এরপরই শুরু হয়ে গেল পরস্পরের নিন্দা-মন্দ, গালা-গালি, হাতা-হাতি, অস্ত্র নিক্ষেপ এবং মৃত্যু। ভাই ভাইকে, পুত্র পিতাকে পরস্পর হত্যাকরে নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠেছে সকলে।

জরা ব্যাধের বাণবিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণের মৃত্যুকে কাশীরাম পূর্বজন্মের কৃতকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। কৃষ্ণ ব্যাধকে বলেছেন, 'তব পিতৃঘাতী আমি/ ত্রেতাযুগে রাম নামে হৈনু অবতার/ চোরা বাণে বিনাশিনু/ তব পিতা বালী কপিরাজে/ নাম তব ত্রেতায় অঙ্গদ যুবরাজ।'(৫/১) পরজন্মে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞাকে ভক্তের বাসনা রূপে দেখানো হয়েছে, 'ভক্ত যাহা চায়, তাই পায় আমার গোচর।'(৫/১)

কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দেবকীর অর্জুনকে কৃষ্ণভ্রমে সম্মোধনের মধ্যে মাতৃস্নেহের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের শেষাংশে অনেক মৃত্যুর হাহাকার থাকলেও নাটকের মধ্যে ট্র্যাজিডির রস অঙ্গীভূত হয়নি। অর্জুনের হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস, দ্বারকাপুরী হতেও শ্মশান অর্জুনের হৃদয়। দস্যু হস্তে অর্জুনের পরাভবের মধ্যে আত্মগ্লানি, 'শকতি বঞ্চিত এত দিনে!/ কৃষ্ণ বিনে অর্জুন অসার/ কেশরী শৃগাল হল আজ/ শৃগালেরা হইল কেশরী।'(৫/৬)

কাশীরাম - ''এড়েন অক্ষয় অগ্নিবাণ ধনঞ্জয়।
অস্ত্র যত এড়িলেন সব ব্যর্থ হয়।।
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণ গুরুস্থানে।
যত বিদ্যা পাইলেন অমর-ভুবনে।।
এ তিন-ভুবনে যারে মাগে পরাজয়।
দস্যুসহ রণে সর্ব্ব-অস্ত্র ব্যর্থ হয়।।''[১৩]

ব্যাস দেব অর্জুনকে বলেছেন, 'দস্যু করে স্পৃষ্ট হয়ে যদুনারী কুল/ শিলাময়ী হইয়াছে অষ্টাবক্র শাপে/ শক্তি তব মিশিয়াছে কৃষ্ণের শরীরে/ তোমাতে নাহি কো তুমি আর/ মৃত তুমি জীবন্ত

জীবনে।'(৫/৭) যদুনারীদের পাষাণে পরিণত হওয়া ও অষ্টাবক্র মুনির সাপ কাশীরামের কাহিনি অনুবর্তন করেছে।

নাটকের শেষে পটপরিবর্তন করে সিংহাসনে লক্ষীর সঙ্গে বিষ্ণু উপবিষ্ট ও অপ্সরাদের নৃত্যগীতের মাধ্যমে বিয়োগ যন্ত্রনা লাঘবের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে ব্যাসদেবের দিব্যচক্ষু দানে যেমন মৃতপূর্ব সকল আত্মীয়কে দেখতে পান, এই নাটকের ক্ষেত্রে ব্যাসদেব অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করে গোলক ধামে গোলকনাথকে প্রত্যক্ষ করালেন।

বাংলা নাটকের দর্শক বিয়োগ যন্ত্রণা দিয়ে পরিসমাপ্তি দেখতে পছন্দ করেন না। তাই নাট্যকারকে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য মিলনান্তক দৃশ্য রচনা করতে হয়। মহাভারতের পরিসমাপ্তিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানেই ঘটে নি। যুদ্ধের পরও আরো বহুকাল ধরে প্রলম্বিত পথে চিরায়ত শান্তির অন্বেষণে প্রচীন কবিরা তাঁদের লেখনি অব্যহত রেখেছিলেন।

প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৯১) :

কাশীরামের আখ্যানকে রাজকৃষ্ণ রায় অনুসরণ করলেও নাটকের সূচনা অংশে তিনি মৌলিক ঘটনার অবতারণা করেন। হিরণ্যকশিপু ভাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মন্দর পর্বতে তপস্যা করতে গেলে দেবতাগণ তার রাজ্য আক্রমণ করেছেন। দৈত্যরাজ মহিষী গর্ভবতী কয়াধূকে ইন্দ্র হরণ করে নিয়ে গেলে মহর্ষি নারদ বাধা প্রদান করেন। ইন্দ্র পরস্ত্রীর মোহে কয়াধূকে হরণ করেন নি তার গর্ভস্ত শত্রুপুত্রকে বিনষ্ট করার কথা প্রকাশ করলে নারদ জানান, 'পরম বৈষ্ণব শিশু এই গর্ভকোষে।'(১/৪) নারদের আশ্বাস বাক্যে কয়াধূকে ছেড়ে দিলে তিনি শ্মশানপুরী সম দৈত্যপুরীতে ফিরে না গিয়ে দেবর্ষির আশ্রমে আশ্রয় নেন।

গুরু ষন্ড ও অমার্ক প্রহ্লাদকে দৈত্যকুলোচিত শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হলে হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণদ্বয়কে অভিযুক্ত করেন। 'এই দুই লোভী বিপ্রাধম/ বিষ্ণু পাশে লইয়া উৎকোচ/

প্রহ্লাদেরে শিখাইল বিষ্ণুনাম।'(২/৪) অমার্জিত ও অযোগ্য শিক্ষাগুরুরা নাটকে স্থূলহাস্যরস সৃজন করেছে। পুত্রকে শাসন করতে ও শাস্তি বিধানে গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখা যায় তা রাজকৃষ্ণের নাটকে নেই। এই নাটকে হিরণ্যকশিপু যান্ত্রিক ভাবে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তুলনায় মাতা কয়াধূ চরিত্রের দিকে রাজকৃষ্ণ মনোযোগ দিয়েছেন। 'চল্ বাপ্/ মায়ে পোয়ে নির্জন অরণ্যে বা পর্বত গুহায়/ নুকিয়ে থেকে হরিনাম গাই/ কাজ নাই রাজগৃহে ফিরে।'(৩/১)

মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণাকে রাজকৃষ্ণ ফুটিয়ে তুলেছেন অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের নাটকে হিরণ্যকশিপুর সক্রিয়তা বেশি। তিনি বারেবারে পুত্রকে স্বধর্ম পথে আনার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে প্রহ্লাদ পিতাকে হরি নামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। নাটকের শেষ দিকে দেখা যায় সে রাজ্যের সকলকে হরি নামে মাতিয়ে তুলেছেন। মহাভারতে অনেক দুরহ পরীক্ষার পর দৈত্যরাজ পুত্রের কাছে হার মেনে ছিলেন, এই নাটকে প্রহ্লাদ হরি নামের মহিমায় সমগ্র দৈত্যপুরী জয় করেছেন।

প্রহ্লাদকে হত্যার জন্য নিযুক্ত হস্তী এবং তীব্র গরল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাহুত ও ধাত্রীর মনে স্নেহপূর্ণ দুর্বলতা মানবিক রসে জারিত। মাহুত বলেছেন, 'আহা যে প্রহ্লাদকে কোলে তুলে/ হাতীর পিঠে চড়িয়ে বেড়াই/ আজ তাকে/ হাতীর পায়ের তলায় ফেলবো/ রাজা আমায় খুন করুন/ তবু আমি পারবো না -পারবো না/ আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চল্লেম।'(২/৬) অন্যদিকে বিষপানে প্রহ্লাদের মৃত্যুতে মন্ত্রীদ্বয় রাজ্যের ভাগ পাওয়ার সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হন। মন্ত্রীদের আস্ফালন নাট্যকারের সংযোজন। তাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপের ঘটনাকে নাট্যকার হরিভক্তির আনুকূল্যে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। গুরুদেব ষণ্ড প্রহ্লাদকে অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন, 'এই জ্বলচ্চিতায় তুমি যদি ঝাঁপ দাও/ অথচ পুড়ে না মর/ তবে আমরা হরি বলতে পারি।'(৩/১)

মহাভারতে ভাতৃহত্যার প্রতিশোধের কথা হিরণ্যকশিপু মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। তাঁর হরিবিদ্বেষী ভাব তাকে ক্রমশই নিষ্ঠুরতর করেছে। নৃসিংহ অবতারের হাতে বিনাশের পূর্ব পর্যন্ত তার ক্রোধ প্রশমিত হয় নি। নাট্যাংশের শেষে তাকে অর্ধদেহ সিংহমূর্তির ছায়া দেখে ভীত হতে দেখা যায়। তিনি চিৎকার করেন, 'দে বিষ আমায় -দে বিষ আমায়/ আত্মহত্যা মঙ্গল আমার।'(৪/২) দৈত্যরা প্রহ্লাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে হরিবোল হরিবোল কীর্তনে মেতে উঠেছে। শুধুমাত্র হিরণ্যকশিপুর বিনাশ নয়, সমগ্র রাজ্যকে হরিনাম সংকীর্তনে মাতিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। নাটকে ভক্তিরসের স্ফুরণ ঘটানোই রাজকৃষ্ণ রায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪২-১৮৯৭) :

বাংলার প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩) প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। আজীবন তিনি এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি সৌখিন নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), মেট্রোপলিটন থিয়েটার (১৮৫৯) ও শোভাবাজার নাট্যশালায় (১৮৬৭) যথাক্রমে 'রত্নাবলি', 'বিধবা বিবাহ' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে তাঁর আভিনয় বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। শেষ বয়সে তিনি মঞ্চাবতরণ না করলেও প্রত্যেক অভিনয়ের রাত্রে দর্শকদের মধ্যে বসে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর লেখা বহু নাটক এই থিয়েটারে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'পঞ্চনট'-এ বিহারীলালের অভিনয় ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেছেন।

> ''বিহারীবাবু কেবল অভিনয়-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন-এমত নহে। তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক বেঙ্গল থিয়েটারে বিপুল অর্থাগমের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠে পাঠক তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইবেন ও সেই সকল পুস্তকের অভিনয়-দর্শকের মনোরঞ্জনকারী।''[১৪]

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যধারার অন্যতম অনুসারী। পৌরাণিক যাত্রাপালা, গীতাভিনয় এবং গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, ধর্মপ্রাণ বাঙালি সামাজিক নাটক বা প্রহসন অপেক্ষা পৌরাণিক নাটকেই বেশি তৃপ্তি পায়। সমসাময়িক মঞ্চের দাবি মেটাতে তিনি অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি গৈরিশছন্দ ও মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থ অনুকরণ করেছেন। মহাভারতের কাহিনি অনুসরণে তাঁর রচিত নাটকগুলি হলো - দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূয় যজ্ঞ (১৮৮৫), পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৮৮৯), সুভদ্রা-হরণ, দুর্যোধন-বধ, পান্ডব নির্বাসন, ভীষ্ম-মহিমা।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (১৮৮৪) :

মহাভারতের আদিপর্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা নাটকের মূললক্ষ্য হলেও নাট্যকার কাহিনির সূত্রপাত করেছেন পান্ডবদের বারণাবত নগরে প্রেরণের পরিকল্পনা থেকে। পাঁচ অঙ্কের এই নাটকে প্রথম তিনটি অঙ্ক ব্যয়িত হয়েছে পূর্ব ঘটনার বর্ণয়ায়। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দ্রৌপদীকে প্রথম দেখা যায়। বস্তুত শেষ দুটি অঙ্কই নাটকের নামের সঙ্গে সাজুর্যপূর্ণ। হস্তিনাপুরের শত্রু বেষ্টনী থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভীমের বারণাবত নগরে স্থায়ীভাবে থাকার অমহাভারতীয় ইচ্ছের বিপক্ষে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের সংলাপে মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

যুধিষ্ঠির : জননী জনম ভূমি শ্রেষ্ঠ স্বর্গ হতে।
অর্জুন : ত্যজিবে কি জন্মভূমি নাশিতে পৌরুষ?
অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম মধ্যম পান্ডব
কেন যে বলেন হেন বুযিতে না পারি। (১/৪)

জতুগৃহ দাহের পর হিরিম্বার উপাখ্যান নাটকের কলেবর বৃদ্ধি করেছে মাত্র। কাশীরামের পয়ারকে অমিত্রাক্ষরের ছাঁচে ফেলে নাটকে হিড়িম্বার প্রতি হিড়িম্বর সংলাপের সাদৃশ্য রয়েছে।

কাশীরাম : ''ধিক্ তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মনুষ্য-স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনী।।''[১৫]

নাটক : ‘মজিয়া মনুজ শরে কুলকলঙ্কিনী?

ধিক্ তোরে, মন্দভাগী অসতী কামুকী!’(২/১)

বিহারীলাল কাশীরামের আখ্যানকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত অজুর্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কাশীরামের বিবরণই তুলে ধরেছেন।

‘‘অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।

মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।

খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।।’’[১৬] (৪/১, কাশীরাম- ‘আদিপর্ব’)

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী লাভের নেপথ্যে মহাভারতে যেদুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে নাটকেও তা অনুসৃত হয়েছে।

‘‘সুরভীর শাপ আর পশুপতিবরে।

পঞ্চপতি পাবে সতী কহিনু তোমারে।।’’[১৭]

একই সঙ্গে পাঁচ জনকে স্বামীরূপে বরণের ক্ষেত্রে নারী মনের স্বাভাবিক অনুভূতি যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে নাটকে তার উল্লেখ নেই। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দ্রৌপদীর যে সংকট নাটকে দেখানোর সুযোগ ছিল কাশীরামের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই তা বিনষ্ট করেছে। অর্জুনের প্রতি ভালোবাসার কথা মধুসূদন তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন নাটকে তার পরিস্ফুটন ঘটেনি।

‘‘পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি

ধনঞ্জয়। এই জানি, এই মানি মনে।

যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি

ভালবাসি নৃমণিরে, -যা ইচ্ছা, নৃমণি।’’[১৮]

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দ্রৌপদীর মনের প্রতিচ্ছবি স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলেই নিভে গেল।

‘হে কেশব! পূরিবে কি হৃদয় বাসনা?

পিতার উদ্দেশ্য নাথ হবে কি সফল?

আছে কি জীবিত আজো নরনারায়ণ?
পাবে কি বরিতে দাসী তৃতীয় পাণ্ডবে?'(৩/৪)

দ্রৌপদীর আখ্যানে বিহারীলাল প্রচলিত কাহিনিকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। আধুনিক যুগের নারীর মর্যাদাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। পূর্ববর্তী যুগের মধুসূদনের নায়িকারা পাশ্চাত্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন বিহারীলালের দ্রৌপদীর মধ্যে তার অভাব রয়েছে।

সুভদ্রা-হরণ :

সুভদ্রা-হরণ নাটকটি মূলত গানের মালা। বিহারীলাল একে 'গীতিকা' বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত সুভদ্রা হরণের কাহিনি নিয়ে প্রথম বাংলা নাটক রচিত হয়েছিল তারাচরণ শীকদারের হাতে 'ভদ্রার্জুন' নাটকে। বিহারীলালের নাটকটি তুলনায় ক্ষুদ্রাকার, দুটি অঙ্কে সীমিত। শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার ভূমিকাই বেশি। কালীপ্রসন্নের অনুবাদে সত্যভামা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রেও বিহারীলাল কাশীরামকেই আশ্রয় করেছেন। অর্জুনকে দেখার পূর্বেই যৌবনবতী সুভদ্রার মনকে প্রেমের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন তিনি। মহাভারতে রৈবর্তক পর্বতের মহোৎসবে অর্জুন সুভদ্রার সাক্ষাৎ হয়। নাটকে উৎসব নেই বনের মধ্যে তাদের দেখা হয়। সুভদ্রাহরণের বিস্তৃত আখ্যান কাশীরামের বর্ণনায় নাটকীয় চাতুর্যে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সে তুলনায় বিহারীলালের গীতিকা অপুষ্ট। অর্জুন-সুভদ্রার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, সত্যভামার ঘটকালী ও অর্জুনের ব্রহ্মচারীত্বের প্রতি ব্যঙ্গ, সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের কাম ভাব, কৃষ্ণের সহায়তায় সুভদ্রা হরণ, দুর্যোধনের আস্ফালন, বলরামের আপত্তি ও শেষ পর্যন্ত উভয়ের মিলনের ঘটনা কাশীরামকেই অনুবর্তন করেছে। এর বিশেষত্ব সুরঝঙ্কারে। নাট্যকার টোড়ি, ভৈরবী, মালকোষ, ইমন, মূলতানী, কাফি, বাগেশ্রী ইত্যাদি বহু রাগ-রাগিনীর ব্যবহার করেছেন।

রাজসূয় যজ্ঞ (১৮৮৫):

মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বাসনা এবং তা বাস্তবায়িত করার প্রধান অন্তরায় জরাসন্ধ বধ থেকে শুরু করে শিশুপালের নিধন পর্যন্ত ঘটনাকে আশ্রয় করে বিহারীলালের নাটক 'রাজসূয় যজ্ঞ'। বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে এই আখ্যান ভাগ নাটকের পক্ষে খুবই উপযোগী। জরাসন্ধ ও শিশুপালের প্রবল পরাক্রমকে বিনষ্ট করে পাণ্ডবদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার অন্যতম উপলক্ষ্য রাজসূয় যজ্ঞ। জরাসন্ধের কাছে বারংবার পরাজিত কৃষ্ণ কূটকৌশলে তাকে হত্যা করার যে ছক অঙ্কন করেছেন তা গর্হিত হলেও রাজনীতির অঙ্কে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের পথকে সুগম করে। রাজসূয় যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে জ্ঞাতিশত্রু শিশুপালকে সকল রাজার সম্মুখে প্রকাশ্যে হত্যা শ্রীকৃষ্ণের উত্তরণের দ্বিতীয় ধাপ। এই পর্বের নায়ক যুধিষ্ঠির কিংবা ভীমার্জুন নন, শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ : ছদ্মবেশে শত্রুগৃহে পশি সংগোপনে
নাশিব সংসার অরি মগধ ঈশ্বরে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞগৃহে পশি গুপ্তভাবে
পবননন্দন আর বিভীষণে লয়ে,
সৌমিত্রি কেশরী যথা নাশে মেঘনাদে,
সেই মত পাবনি হে মোদের সহায়ে
দুর্ম্মদ সে জরাসন্ধে মর্দ্দিবে নিভৃতে।(১/১)

জরাসন্ধ : গোপান্নে পালিত যেই হয়ে বাল্যকালে
গোপাঙ্গনা কুলমান নাশে বেণু রবে
স্ত্রীহত্যা গোহত্যা আদি পাতক যে করে
ছলে যেই দুষ্ট বধে আপন মাতুলে
যদু কুলাঙ্গার সেই কৃষ্ণ কিরে তুই?
নির্লজ্জ লম্পট চোর হেয় কাপুরুষ
তোর সম ত্রিভুবনে আর কে বা আছে?'(২/৩)

কালীপ্রসন্নের মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞে হিড়িম্বা অনুপস্থিত, তাকে নিয়ে এসেছেন কাশীরাম। মধ্যযুগের সপত্নী কলহের সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেন নি।

দ্রৌপদী : মোরা সবে রাজপুত্রী তুমি লো রাক্ষসী
একাসনে বসিবার যোগ্যা কভু নহ।(৩/৮)
হিড়িম্বা : ''আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তোর বিবাহের আগে বিবাহ আমার।।''[১৯]

ময়দানব কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদের মায়াজালে দুর্যোধনের বিড়ম্বনা দৃশ্য নাটকে বর্জন করে তা দুঃশাসনের জ্বালাময়ী বক্তব্যে উপস্থাপন করে স্থূলতা পরিহার করেছেন। দুর্যোধনকে অপেক্ষাকৃত সরল ভাবে দেখানো হয়েছে।

দুঃশাসন : 'যবে সভাতলে তুমি সবার মাঝারে
শিল্পকর কারুকার্যে হলে অপ্রতিভ
খলখল খল ভীম হাসি অবিরাম
অপমান করে তোমা কৌরব প্রধান।' (৩/৪)

কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দানের প্রতিক্রিয়ায় শিশুপালের কৃষ্ণ ও ভীষ্ম নিন্দায় নাটকে ক্রাইসিস সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। কৃষ্ণের প্রতিস্পর্ধী জরাসন্ধের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও শিশুপালের নিদারুণ যুক্তি কৃষ্ণকে বিচলিত করতে পরেনি। বিহারীলাল কৃষ্ণ পক্ষই অবলম্বন করেছেন। মহাকাব্যের বর্ণনাধর্মী আখ্যানকে তিনি নাটকে রূপান্তর করেছেন মাত্র।

দুর্যোধন-বধ :

দুর্যোধন-বধ নাটকের কাহিনি মহাভারতের শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব ও স্ত্রীপর্বের বিস্তৃত আখ্যানকে অনুসরণ করেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে ভীমের অন্যায় গদাঘাতে দুর্যোধনের প্রাণনাশ, অশ্বত্থামার পাণ্ডব শিবিরে নৈশঅভিযানের গুপ্তহত্যা, ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম চূর্ণ করণ, গান্ধারীর অভিশাপ ইত্যাদি বহু ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে পঞ্চাঙ্কের এই নাটকে। একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা

বিনষ্টের পর রণক্লান্ত দুর্যোধন দ্বৈপায়ণ হ্রদে মায়াবলে জলস্তম্ভণ করে আত্মগোপন করলে যুধিষ্ঠির নিন্দা সূচক কটূক্তি দ্বারা তাকে উত্তেজিত করেন।

''গর্বিতস্বভাব রাজা বলে মহাবল।
সহিতে নারিল নিন্দা বচন সকল।।''[২০]

নাটকে দুর্যোধন প্রত্যুত্তর করেছেন-

'যদি হতে সমযোগ্য রণে, তা হলেও-
তা হলেও, তব বাক্যে হইতাম সুখী।'(১/৩)

পঞ্চ পাণ্ডবের যে কোন একজনের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত দুর্যোধন প্রতিপক্ষ রূপে ভীমকে নির্বাচন করেছেন। বীরের ধর্মানুযায়ী জরাসন্ধও সমযোদ্ধা রূপে ভীমকেই বেছে নিয়েছিলেন।

দুর্যোধন : অতএব ভীম সনে
করিব সমর; করিব হে গদা যুদ্ধ
ভীমের সহিত ঘোরতর।
ভীম : তব তুল্য উপহার আনিয়াছি আজ
হের কুরুপতি!(গদা প্রদর্শন)- ১/৩

নাটকে গদা যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন গুরুপ্রণাম জানিয়েছেন বলরামকে কিন্তু ভীম কৃষ্ণের চরণ বন্দনা করেলেন অথচ উভয়েই বলদেবের শিষ্য। রাজনীতির দিক থেকে বলরাম কখনওই কনিষ্ঠকে অতিক্রম করতে পারেননি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বলরামের ক্রোধ শ্রীকৃষ্ণ প্রশমিত করেছেন।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় নাট্য চরিত্রের থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কাহিনির উপর। তিনি মহাভারতের বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাটক রচনা করলেও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অসফল। তাঁর নাটকে দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে। পৌরাণিক চরিত্রকে নবরূপে আবিষ্কারের চাইতে পুরাণ কাহিনি দৃশ্যায়নের দিকেই নাট্যকারের মূল লক্ষ্য।

ভগ্নউরু দুর্যোধনের আত্মম্ভরী সংলাপ :

বীর দর্পে শাসি
ধরা চলিলাম অমর নগরে, পড়ি
কুরুক্ষেত্র পুণ্য-রঙ্গ মাঝ! ভুঞ্জহ এ
অবনীতে লইয়া কেবল কুরুকুল
বিধবা রমনী, -দিবারাত্র তাহাদের
ক্রন্দনের ধ্বনি, তুষিবে তোমারে সদা
বন্দী-গীতরূপে! (২য় অঙ্ক)

দুর্যোধন ছাড়াও এ নাটকে অশ্বত্থামা, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী চরিত্র সৃজনে নাটকার কোনো অভিনবত্বের সৃষ্টি করতে পারেন নি। সংস্কৃত নাট্যকার ভাস তাঁর 'ঊরুভঙ্গম' নাটকে স্বল্প পরিসরে দুর্যোধনের চরিত্র সৃষ্টিতে পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন। একই বিষয় নিয়ে আধুনিক কালের নাট্যকার মনোজ মিত্র 'অশ্বত্থামা' নাটকে অশ্বত্থামাকে যেভাবে নির্মাণ করেছেন তা বিহারীলালের নাটকে অপ্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদনে' বা বুদ্ধদেব বসু 'গান্ধারীর অভিশাপ' কাব্যনাট্যে দু-একটি চরিত্রের বিশেষ জায়গায় আলোকপাত করেছেন। পৌরাণিক নাটকের যুগের নাট্যকারেরা বহুবিস্তৃত আখ্যানকে নাটকের মধ্যে স্থান দিতে গিয়ে প্রায়শই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন।

পান্ডব নির্বাসন :

মহাভারতের সভাপর্বে রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য চাকচিক্যে প্রলুব্ধ দুর্যোধনের মনে ঈর্ষা ও হীনমন্যতা জাত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে শকুনির পরামর্শে পাশা খেলার আয়োজন করা হয়। সম্ভাব্য পরিনতি অনুমান করেও দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কৌরব পক্ষের স্পর্ধিত আহবান এড়িয়ে যাননি। সর্বস্ব হারিয়ে পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদীর চরম অবমাননা সহ্য করে অরণ্যবাস মেনে নিয়েছিলেন। মহাকাব্যের এই বিষয়কে 'পান্ডব নির্বাসন' নাটকের উপজীব্য করেছেন নাট্যকার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

ঈর্ষানলে কাতর দুর্যোধনের মনস্তাপ প্রশমনের জন্য শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করার পরামর্শ দেন।

''শকুনি বলিল এই শুন দুর্যোধন।
পাশায় নিপুন নহে ধর্ম্মের নন্দন।।
তথাপিহ ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে।
মম সহ খেলি জিনে, নাহিক সংসারে।।
ক্ষত্রনীতি আছে হেন যদ্যপি আহ্বয়।
কিবা দ্যূতে কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয়।।''[২১]

মহাভারতে শকুনির কৌরববংশ ধংসের আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। গান্ধারকুল নাশের প্রতিশোধ স্পৃহা নাটকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে শকুনির বক্তব্যে-

'সুবল আমার পিতা গান্ধার ঈশ্বর,
অকারণে বদ্ধ করি তাঁরে কারাগারে
বিনষ্ট করেছে মূঢ় বিধি বিড়ম্বণে,
বিদরে অন্তর মোর সে কথা স্মরিলে।'(১/১)

পাণ্ডবের ঐশ্বর্য গৌরব, প্রকাশ্যে শিশুপালের হত্যা, ভীমের তীব্র শ্লেষ, দ্রৌপদীর উপহাস ইত্যাদি মানী দুর্যোধনের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাই কুচক্রী শকুনির পাশা খেলার আয়োজন-

'বিনা রক্তপাতে শত্রু হবে পরাজিত।
জলস্পর্শ না করিয়া মীনেরে বধিব,
গৃহে বসে শার্দ্দুলেরে বাঁধিব কৌশলে।' (১/১)

কর্ণ পাশাখেলার হীনপন্থার পরিবর্তে যুদ্ধে আহ্বান করার কথা উত্থাপন করলেও দুঃশাসন শকুনির ছল-কৌশলকে সমর্থন করেছেন। নাটকে বিদূষক ও দুর্যোধন পত্নী ভানুমতীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু এই দুটি চরিত্রের যথাযথ চিত্রাঙ্কনে বিহারীলাল সফল

হননি। বিদূষকের বক্তব্যে ব্যঙ্গ আছে রস নেই। ভানুমতির আচরণে রাজমহিষীর ভাব অপরিস্ফুট।

পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাশা খেলার অনুমতি আদায় করে পাণ্ডবদের নিকট দূত হিসেবে বিদুরকে প্রেরণ করা হয়। বিদুরের মনোভাবকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে চালনা করার জন্য নাটকে অলৌকিক ভাবে উপস্থিত হয়েছেন দেবী কমলা। তিনি বিদুরকে বিধাতার ইচ্ছের কথা জানান-

'তাঁর ইচ্ছা যুধিষ্ঠির দুরোদর পণে
হারাইয়া রাজ্যধন হয় বনবাসী।'(২/১)

নাটকে যুধিষ্ঠিরের 'নিশার স্বপনে' তের বছরের মধ্যে কুরুকুল ধ্বংস হওয়ার ইঙ্গিতকে ভীম ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিদুরের আগমনে অমঙ্গল সূচক ভীমের হাত থেকে গদা স্খলিত হওয়া ও দ্যূতের প্রস্তাবে মধ্যম পাণ্ডবের ক্রোধ নাটকে সংযোজিত হয়েছে।

'ইচ্ছা করে হস্ত পদ ভাঙি সে অন্ধের
শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখি পিঞ্জর মাঝারে
গদাঘায় গুঁড়া করি মূঢ় দুর্যোধনে।'(২/১)

হস্তিনাপুরে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরকে শকুনি তির্যক বাক্যে ক্রমশ উত্তেজিত করেন -

কাশীরাম : ''যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার।।''[২২]

নাটক : 'পুরুষ কেশরী তুমি, তাই হে তোমায়
আবাহিনু সুহৃদ্দ্যূতে, পাণ্ডব-প্রধান।
ভীত যদি এবে তুমি ধন মমতায়
কাজ কিহে ক্ষান্ত হও, না চাহি খেলিতে।' (৪/১)

শকুনির নারী ললুপতার কথা মহাভারতে নেই, কিন্তু দাসী সকল জয়ের পর নাটকে দুর্যোধনকে বলেছেন-

'সব লও দুর্যোধন ক্ষতি নাহি তায়
দাসীগুলি কিন্তু বাছা দিয়ো বেঁটে সেটে।'(৪/১)

আসন্ন বিপদের সম্ভাবনার বিদুর বাধা প্রদান করলে দুর্যোধন তাকে দ্বিচারিনী নারীর সঙ্গে তুলনা করেন। কৌরবের অন্নে প্রতিপালিত হলেও তিনি সর্বদা পাণ্ডবের হিতাকাঙ্ক্ষী। দুর্যোধনের জেদের কাছে হার মেনে পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিরবে প্রশ্রয় দিয়েছেন সর্বনাশী দ্যূতে। নাটকে শকুনি পাশার দান ফেলার মাঝে মাঝে ভনিতা করছেন, এই বুঝি হেরে যাবেন। মহাভারতে শকুনির ভনিতা নেই, তিনি পেশাদারী ভঙ্গিতেই যুধিষ্ঠিরের ক্রম সর্বনাশ করেছেন। আর যুধিষ্ঠির যতই হারছেন তাঁর মত্ততা ততই বেড়ে যাচ্ছে। ভাতৃ চতুষ্টয়, তিনি স্বয়ং এবং দ্রৌপদীকে পাশার ছকে বাজি রেখে সর্বশান্ত হন ধর্মপুত্র। নাটকে কর্ণকে অতি মাত্রায় সক্রিয় হতে দেখা যায়। বিকর্ণকে শাসন করে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় দুঃশাসনকে উত্তেজিত করেছেন তিনি। দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের কটূ বাক্য -

‘একাধিক স্বামী তোর, যদৃচ্ছাচারিণি
বেশ্যা তুই, তোর কিবা লজ্জা, কলঙ্কিনি!’(৪/১)

রাজ্যে দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় গান্ধারীর হস্তক্ষেপে এবং ধৃতরাষ্ট্রের বরে রাজ্যধন ফিরে পেলেও অন্তিম খেলায় পাণ্ডবদের নির্বাসন প্রতিরোধ করা যায়নি। মহাভারতের মূল আখ্যান বিহারীলাল অবিকৃত ভাবেই গ্রহণ করেছেন।

ভীষ্ম-মহিমা :

মহাভারতের আদিপর্ব ও উদ্যোগপর্বের ভীষ্ম ও অম্বার কাহিনি অনুসরণে নাটকটি রচিত। ভীষ্মের সমগ্র জীবন একটি নাটকের মধ্যে উপস্থাপন করা প্রায় অসম্ভব সেখানে বিহারীলাল তাঁর নাটকের কাহিনি শুরু করেছেন শান্তনু ও গঙ্গার পৌরাণিক আখ্যান থেকে। গঙ্গা তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে বরণ করে নিতে রাজি হয়েছেন। পরবর্তী কলে ধীবর কন্যা সত্যবতীকে গ্রহণের ক্ষেত্রেও আরোপিত হয়েছিল কঠিনতম শর্ত। মহারাজ শান্তনুর এহেন দুর্বলতার জন্য মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দিতে ভীষ্ম তাঁর নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। নাটকে শান্তনু সম্পর্কে দুই নাগরিকের সংলাপে মহারাজের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে।

১ম নাগরিক : মহারাজ হরিণ শিকার করতে গিয়ে একটি পরম সুন্দরী মেয়ে মানুষ শিকার করে এনেছেন।

২য় নাগরিক : মহারাজ তাঁকে শিকার করেছেন, না তিনি মহারাজকে শিকার করেছেন। এবার মহারাজের দফারফা! রাণী উঠতে বল্লে তিনি উঠবেন, বসতে বল্লে তিনি বসবেন। (১/২)

মহাভারতের কাহিনি অনুযায়ী গঙ্গা সদ্যজাত সাতটি শিশুপুত্র জলে বিসর্জন দিয়েছেন এবং শান্তনু মর্মাহত হলেও বাধা প্রদান করেননি। অষ্টম সন্তান ভীষ্মকে রক্ষার অভিপ্রায়ে গঙ্গাকে ভর্ৎসনা করলে, গঙ্গা পুত্রকে প্রত্যার্পনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেন। কিশোর দেবব্রতকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার পর যথাসময়ে তার রাজ্যাভিষেকের কথা ঘোঘণা করেন। মহারাজ শান্তনু সত্যবতীর মোহিনীমায়ার প্রলুব্ধ হয়েও ধীবরের শর্তে বিমূখ হয়ে অবদমিত কামনায় ক্রমশ কৃষতর হতে থাকেন। শান্তনুর রাজস্বভাবের সমালোচনায় নাটকে বিদূষক চরিত্রের আগমন ঘটেছে। 'সেই একবার শিকার কর্ত্তে গিয়ে একটা বর্ণশ্রেষ্ঠা মেয়ে মানুষ এনে কত নাকালই না হয়েছিলেন, . . . এ আবার কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার বলুন দেখি? একটা জেলের মেয়ে ছ্যা ছ্যা!'(২/৪)

দেবব্রতের পিতৃভক্তি মাত্রাতিরিক্ত। মহাভারতে শান্তনুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো জিজ্ঞাসা নেই। নাটকে তিনি পিতৃ আনুগত্য বিষয়ক কতগুলি উদাহরণও রাজ মন্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করেলেও কিঞ্চিত অভিমান অপ্রকাশিত থাকেনি। দাশরাজের কন্যা সম্পর্কে তিনি কিন্তু প্রকাশ করলেন। 'সত্যনিষ্ঠ পুণ্য প্রকৃতি ধর্ম্মাত্মা পিতার দাশ-কন্যায় প্রবৃত্তির কারণ কি?'(২/৫) আবার পিতার জন্য আত্মত্যাগের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভও প্রকাশিত হয়ে পরে, 'এই ত্যাগ স্বীকার করে সংসারকে শিক্ষা দিব।'(২/৫) মহাভারতে ভীষ্মের ঔদার্য ছিল প্রশ্নাতীত -

''পিতার বিবাহ-হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার।।
. . . .

তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার।।''[২৩]

ভীষ্মের চির কৌমার্যের প্রতিজ্ঞায় দেবগণ যতই পুষ্পবৃষ্টি করুন না কেন নাটকে নাগরিকগণ শান্তনুর এহেন কার্যের নিন্দা করেছেন, 'এতকাল ব্রহ্মচর্য্যায় থেকে শেষে একটা কৈবর্ত্তের মেয়ের একটু কটা চামড়া দেখে পাগল হয়ে এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে একবারে দায় মজিয়ে দিলেন'(২/৭)

নাটকের তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়েছে পরবর্তী প্রজন্ম সত্যবতী সুত চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের কাহিনি থেকে। শান্তনুর মৃত্যুর পর নাটকে সত্যবতী রাজ্যভার গ্রহণের জন্য ভীষ্মের প্রতি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করেন। ''শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।''[২৪]

নাটকে : 'তব বিদ্যমানে মম চিত্রাঙ্গদ সুতে।
হস্তিনার সিংহাসন কভু না যুয়ায়।
মম বাক্য রক্ষা করি পুত্র গুণাকর
বিপুল সাম্রাজ্য সুখে করহ পালন।'(৩/১)

বাস্তবিক সত্যবতীর ব্যকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর হস্তিনার শূন্য সিংহাসন পূরণের লক্ষ্যে, তার আগে নয়। চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের জন্য কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ংবর সভার সংবাদ ভীষ্ম লোকমুখে শুনেছিলেন। স্বয়ংবর সভায় তিনি ছিলেন অনাহুত। নাটকে কাশীরাজ একজন ভট্টের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করেছেন ভীষ্মের উদ্দেশ্যে। অপহৃতা অম্বিকা ও অম্বালিকা বিচিত্রবীর্য্যকে পতিত্বে বরণ করে নিলেও জ্যেষ্ঠা অম্বা শাল্বের প্রণয়িনী বলে আত্মপ্রকাশ করলে ভীষ্ম তাঁকে শাল্বরাজের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু শাল্ব তাকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। 'সর্প যে খোলস পরিত্যাগ করে আর গ্রহণ করে না, আমিও তোমায় সেইরূপ পরিত্যাগ করেছি।'(৪/১) কিন্তু নাটকে প্রত্যাখ্যাত অম্বার বেদনা মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে নি।

অম্বার এহেন পরিণতির জন্য তিনি ভীষ্মকেই দায়ী করেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি ভার্গব পরশুরামের স্মরণাপন্ন হন। অম্বাকে গ্রহণের জন্য পরশুরাম ভীষ্মকে নির্দেশ দিলে তিনি গুরুবাক্য অস্বীকার করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ে ভীষ্ম গুরুকে বধ করার জন্য প্রস্বাপাস্ত্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে মহর্ষি নারদ এসে তাঁকে প্রশমিত করেন। ''জামদগ্ন্য প্রস্বাপাস্ত্র প্রতিসংহত দেখিয়া সহসা রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, হে ভীষ্ম! আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম।''[২৫]

নাটকে ক্ষত্রিয় ভীষ্মকে যুদ্ধ থেকে বিরত করা যায় নি। ব্রাহ্মণ পরশুরামকেই নিরস্ত্র হতে দেখা যায়। ভীষ্মের মহিমা প্রকাশ করতেই নাট্যকার গুরুদেবকেই শান্ত করেন, শিষ্যকে নয়।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৮৮৯) :

মহাভারতের আদিপর্বে মৌনব্রতাবলম্বী শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গীর ক্রোধদৃপ্ত অভিশম্পাতের ফলে পরীক্ষিতের প্রাণনাশের কাহিনি অবলম্বনে 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' নাটকটি রচিত। মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত পরীক্ষিতের প্রত্যুত্তে নিশ্চুপ থাকায় শমীক ঋষির গলায় মৃতসর্প জড়িয়ে ব্রাহ্মণের অবমাননা করায় ঋষিপুত্র শৃঙ্গী পূর্বাপর না ভেবে অভিশাপ প্রদান করেন-

''ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেক শাপ হাতে করি জল।।
আজি হৈতে সপ্তদিনে পরীক্ষিৎ নৃপে।
তক্ষক দংশিবে তাকে মম এই শাপে।।''[২৬]

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে মূল কাহিনিতে প্রবেশের পূর্বে প্রস্তাবনা অংশে তিনটি দৃশ্যে পরীক্ষিতের উপর বর্ষিত অভিশাপের নেপথ্যে কলির প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করেন। কতগুলি রূপক চরিত্র- আশা, অলক্ষী, ভ্রান্তি, মদিরা, হিংসা প্রভৃতি কলির সহায়ক রূপে পরীক্ষিতের বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। রাজমহিষী ইরাবতীর কনিষ্ঠা ভগ্নীরূপে মায়াবিনী মিশ্রকেশীর

ইন্দনে পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় প্রতিশ্রুত হন বলে লক্ষী রাজ্যছাড়া হন। 'পরিহারী রাজপুরী আমায় এত দিনে যেতে হলো'(১/২) কলির প্রভাবজাত মিশ্রকেশী নাম্নী কোন চরিত মহাভারতে নেই, পরীক্ষিতের মৃগয়াসক্তির কথা স্পষ্ট রূপে উল্লেখ রয়েছ।

> ''তিনি স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডু রাজার ন্যায় অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্বদাই মৃগ, বরাহ, তরক্ষু, মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার বন্যজন্তু শিকার করিয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন।''[২৭]

কাশীরাম -

> ''সর্ব্বগুণযুক্ত রাজা সদা সত্যব্রত।
> মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে আবিরত।।''[২৮]

রাজার মৃগয়াপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে নাটকে আমদানি ঘটেছে বিদূষকের। দু-একটি সংলাপেই বিদূষক তার জাত চিনিয়ে দিয়েছে, 'আমি গরিব ব্রাহ্মণ, আমোদ করে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াব, আমার কি এ সব পোষায়? . . . কোথা সকালে উঠে সন্ধ্যা আহ্নিক করবো, শিবকে কলা দেখিয়ে খপ্ করে তুলে নিয়ে গপ্ করে খেয়ে ফেলব।'(১/৩)

নাটকে মৌনঋষি শমীকের গলায় মৃতসর্প জড়িয়ে দেবার পরক্ষণেই পরীক্ষিতের মনে অনুশোচনার উদয় হয়, মহাভারতে পরিক্ষীতের তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। পিতার অবমাননায় পুত্র শৃঙ্গী ব্রহ্মশাপ প্রদান করলেও নাটকে মহানুভব ঋষি শমীক পরীক্ষিতের সপক্ষে কষ্টকল্পিত যুক্তি অন্বেষণ করেছেন অত্যাধিক ভক্তিরসের প্রাবল্যে। 'অতিথি যে গৃহীর গৃহ হতে নিরাশ হয়ে ফিরে যান, তিনি তার সঞ্চিত পাপরাশি সেই গৃহস্থকে দিয়ে তার পুণ্যরাশি সকল লয়ে চলে যান; কিন্তু পুণ্যশ্লোক রাজা পরীক্ষিৎ নিজে নিষ্পাপ, আর পাছে ব্রাহ্মণের কষ্টসাধ্য তপার্জ্জিত পুণ্যটুকু তাঁতে অর্শায়, তাই তিনি মনে বিচার করে-আমার এই দণ্ডবিধান করে-আমর তপস্যার পুণ্যটুকু রক্ষা করে গেছেন।'(১/৬)

ব্রাহ্মণের বাক্য রক্ষার্থে মৃত্যুর জন্য পরীক্ষিতের ব্যাকুলতা ভক্তিরসে যতই সিক্ত হোক না কেন বাস্তবতাকে আহত করে। মহাভারতেও ব্রাহ্মণের অবমাননার দিকটি গুরুত্ব দেয়া হলেও জীবনকে অতসহজে উপেক্ষা করা হয়নি।

''আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণের তাপহেতু নিন্দয়ে আপনে।
. . . .
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করায়ে যত মন্ত্রিগণে আনি।।
তক্ষকে দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে।
কি করি উপায় শীঘ্র জানাও আমারে।।''[২৯]

নাটকে পরীক্ষিত বিগলিত হয়ে বলেছেন, সাত দিন কেন, আজই কেন তাঁর মরণ হলো না। এই সাত দিন লোকে বলবে- 'এই পরীক্ষিৎ সেই পাণ্ডুকুলের কুলাঙ্গার রে।'(১/৭)

নাটকে কৃষ্ণভক্তিকে বরাবর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। গর্ভাস্থ অবস্থায় পরীক্ষিৎকে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষাকরার প্রসঙ্গ টেনে এনে পুত্র জন্মোজয় গান ধরেছেন-

'তোমার প্রাণ রেখেছিলেন প্রাণের হরি।
পাণ্ডবের নাথ সদয় যার,
ব্রহ্মশাপে ভয় কি গো তার
এস পিতা পুত্রে মিলে একবার,
ডাকি সেই ভয়-হারী বংশীধারী।'(২/২)

কৃষ্ণনামের মহিমা এতটাই প্রবল যে তক্ষকের মনে হয়েছে, 'ধার্ম্মিক রাজা সাধুজন পরিবৃত হয়ে হরিনাম সুধা পানে বিভোর হয়ে আছেন, এ সময়ে আমার মত সহস্র তক্ষক যদি তাকে দংশন করে তথাপি তাঁর মৃত্যু হবে না।'(৩/২) এক্ষেত্রে মহাভারতকার বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছেন, বিহারীলালের নাটকে মৃত্যু আশঙ্কা ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়ে গেছে।

সর্প দংশন থেকে পরীক্ষিতের প্রাণ রক্ষার্থে বিষবিদ্যা বিশারদ ব্রাহ্মণদের আগমনকে তক্ষক প্রতিহত করছেন। মাথায় দংশন করলে তাগা কোথায় বাঁধা হবে -এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় তক্ষক তাদের উপেক্ষা করলেন। তবে কাশ্যপ মুনির পরিবর্তে নাটকে যে ধন্বন্তরীর উল্লেখ রয়েছে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার তক্ষক হার মেনেছেন। ধন্বন্তরীকে ধনরত্ন দান এবং ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের অলঙ্ঘনীয় অভিশাপ বাক্য লঙ্ঘনের প্রচেষ্টাকে যুক্তিতে অবরুদ্ধ করেন। 'যদি তুমি আমার তীব্র হলাহলকে উপেক্ষা করে পরীক্ষিতের জীবন দান কর, তা হলে অবনীতে আর যে কেউ ব্রাহ্মণকে মানবে না। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের অপমান করতে চাও?'(৩/২)

পরীক্ষিৎ মৃত্যুকে যদি বরণ করে নিতেই চান তাহলে একস্তম্ভের উপর নির্মিত কক্ষে সুরক্ষিত ভাবে অবস্থান করবেন কেন? নাটকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। মূল কাহিনির প্রতি আনুগত্যই বিহারীলালের নাটকের দ্বন্দ্বকে ব্যহত করেছে। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের দেয়া ফলের ভেতর কীটানুবৎ তক্ষকের প্রতি পরীক্ষিতের অভিব্যক্তি, ''সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আজি আর আমার বিষের ভয় নাই। এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক। তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ব্রাহ্মণের বাক্যও সত্য হয়। . . . তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন।''[৩০] মহাভারতের এই হাসির মধ্যে কী একটুও রাজকীয় উপেক্ষা নেই! কাশীরামের আখ্যানেও জীবনের প্রতি একটু মায়া লক্ষ্য করা যায়। ''এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ/ দংশুক আমাকে, থাক্ ব্রাহ্মণ-বচন।''[৩১] বিহারীলাল অতি সরল ভাবে মৃতুকে গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক কালের নাট্যকার মনোজ মিত্র 'তক্ষক' নাটকে সাতদিনের মধ্যে জীবনের যে গভীরতা অনুভব করেছেন তা পৌরাণিক নাটকের যুগের নাট্যকারদের কাছে আশা করা যায় না। মনোজ মিত্রের নাটকে পরীক্ষিতের উপর বর্ষিত ব্রহ্মশাপ নিয়তির অনিবার্য বিধান রূপে স্বীকৃত। কিন্তু যে মৃত্যুভয় প্রতিনিয়ত দংশন করে তার থেকে উত্তরণের দিকে আধুনিক

নাট্যকারের লক্ষ্য। মৃত্যুর মত ধ্রুব অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েও যে জীবনের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয় না এই পার্থিব চিরসত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনি। মৃত্যু ভয়ংকর রূপে সুন্দর, কেননা মৃত্যুর মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই। মিথ্যে লুকিয়ে আছে ভয়ের মধ্যে; মায়াসরোবরের জলে, অলিকঝর্ণার স্রোতে, অলৌকিকফলের ভেতর। বিহারীলালের পরীক্ষিতের মৃত্যুভয়হীনতার ভেতর ব্রহ্মতত্ত্ব যতই থাকুক না কেন আধুনিক জীবনবোধের ছায়া নেই। কেননা, উনবিংশ শতকের নাট্যামোদী মানুষের মনে পারলৌকিক প্রভাব উপেক্ষনীয় ছিল না।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), পৃ: ৫৮৫, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

২. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৪৭১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ৬১৭, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৪. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৪৮৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৪৯০, ঐ

৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৪৯১, ঐ

৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ৮৩১, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ,২০০৮

৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৬৯১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ৯১৬, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১০. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৭০৭, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১১. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খণ্ড), পৃ: ৯১৮, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১২. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খণ্ড), পৃ:১২৩২, ঐ

১৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ১১৭৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৪. গিরিশচন্দ্র ঘোষ : 'গিরিশ রচনাবলী, (৫ম খণ্ড), পৃ: ৩৫৭, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১২

১৫. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ১৪৪, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ১৭৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৭. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২০০, ঐ

১৮. মধুসূদন দত্ত : 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' পৃ: ৩১, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

১৯. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৯৮, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

২০. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৮৮৫, ঐ

২১. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৩২১, ঐ

২২. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ:৩২৬, ঐ

২৩. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৮৪, ঐ

২৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ: ১৫৬, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

২৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ:৯৩৪, ঐ

২৬. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৩০, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

২৭. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ: ৯১, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ,২০০৮

২৮. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ২৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

২৯. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৩১, ঐ

৩০. কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (১ম খন্ড), পৃ: ৯৫, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

৩১. কাশীরাম দাস : 'মহাভারত', পৃ: ৩৩, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩